গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে বাঙালি জীবনের অবক্ষয় : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগের রক্ত এবং শবদেহ মাড়িয়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সাক্ষী থেকে, আর্থিক বিপর্যয় ও দেশভাগের ধাক্কায় শেকল ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো যাঁরা জগৎ ও জীবনকে, ব্যক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) সেই সমস্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন একজন বলিষ্ঠ কথাকার। যাঁর কথাসাহিত্যে উঠে এসেছে সেই সময়কার বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ের নানান দিক। মানুষ যেমন তার ছায়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনি ভাবে কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে গেলে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এসে পড়ে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক। আর এই সময় প্রেক্ষিতে সন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় উঠে এসেছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দেশভাগ, স্বাধীনতা আন্দোলন, নীতি-বিশ্বাস ও প্রেমের অবক্ষয়িত রূপ।

আর তাঁর এই উপলব্ধির শুরু ১৯৩৬ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় পড়তে এসে। যিনি সেই সময়কার সমাজ জীবনকে দেখেছেন নিজের জীবন সংগ্রামে ও নিজের কর্মজীবনে বার্তা সংগ্রাহকের মধ্য দিয়ে। সেদিনের সেই ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ জীবনকে, ভেঙেপড়া অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে তিনি খুব কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই সময় পর্বের দিনগুলিতে তিনি কলকাতায় বসে নিজের চোখে একে একে দেখেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে দেশভাগ ও স্বাধীনতার মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি। যা দেখতে দেখতে তিনি দৈহিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠেছিলেন এবং যা তাঁর লেখনী মনন গড়ে তুলতে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল। আর এ কারণেই তাঁর কথাসাহিত্যে আমরা খুঁজে পাই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে পড়া বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ের এক একটি অধ্যায়কে। যেখানে দেখা যায় স্বাধীনতার পর হাড়-পাঁজর বের হওয়া একটি সমাজকে, যে সমাজে সন্তান তার মায়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারছে না, যে সমাজে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সুমধুর আচরণ করতে পারছে না, প্রেমিক তার প্রেমিকার সম্মান ধরে রাখতে পারছে না। এর পাশাপাশি সন্তোষকুমার ঘোষের

কথাসাহিত্যে আমরা দেখতে পাই মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র লড়াইকে, দেশহারা উদ্বাস্তুদের বোবাকান্নাকে, দারিদ্র্য-বেকারত্বে ভেঙেপড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের বিবেক যন্ত্রণাকে।

আসলে তাঁর সময়কালের পর্বটাই ছিল এমন যে তখন দেশ ও দেশের উপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটা বয়ে যাচ্ছিলো। এমত অবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবন একেবারে অবক্ষয়িত হতে হতে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গিয়েছিল। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব, অন্যদিকে রাজনৈতিক উত্তাল, মন্বন্তর, বস্ত্র সংকট—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে সেই সময়কার সাধারণ মানুষের জনজীবন সংকটের মুখে পড়ে গিয়েছিল। আর তাইতো এই সময় নীতি-নৈতিকতার অধঃপতন ঘটে ও মূল্যবোধের অবক্ষয় নেমে আসে। এই পরিস্থিতিতে দেশে বেকারত্ব এতটাই চরমে ওঠে যে সন্তোষকুমারের মতো মেধাবী ছাত্রকে পড়াশোনা মাঝ পথে বাদ দিয়ে কাজের খোঁজে ঘুরতে হয়। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষ এমন এক ব্যক্তিত্ব যে নিজের জীবনের নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি প্রথাগত রোমান্টিকতার কাহিনি বর্জন করে সমাজ ও মানব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি তুলে এনেছেন অত্যন্ত বিচক্ষণশীল দক্ষতার মাধ্যমে। নানা রঙের দিনে নানান অভিজ্ঞতাগুলি তিনি সাজিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যগুলিকে। যেখানে একদিকে ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ জীবন ও অন্যদিকে জীবন ও সমাজের বদলে যাওয়া পরিবর্তনীয় মানসিকতাগুলিকে তিনি অতি সহজে ধরতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি এক একটি সময় ও সমাজের দলিল হতে পেরেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের উত্তাল পরিস্থিতিগুলিকে যেমন তিনি যুগ ও মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে তুলে এনেছেন, তেমনি তাতে পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষের নীতি-বিশ্বাস ও প্রেমের অবক্ষয়কে দেখাতে পেরেছেন। আসলে সাহিত্যে সমাজের আত্মকথাই মূল বলেই তাঁর কথাসাহিত্যগুলি একদিকে বদলে যাওয়া মানুষের মানসিকতাগুলি ধরে দেয়, অন্যদিকে ক্ষয়ে যাওয়া সামাজিক অবক্ষয়কে দেখিয়ে দেয়। আর এখানেই সন্তোষকুমার ঘোষের কলমের ধার, তাই তিনি বাঙালির অবক্ষয় কালের শেষ অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আছেন।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বিলাতী ডাক'। যেটি ১৯৩৭ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কিনু গোয়ালার গলি', যেটি 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট একশো চোদ্দটি গল্প

ও পনেরোটি উপন্যাসকে বিশ্লেষণ করে তাঁর কথাসাহিত্যে বাঙালি জীবনের অবক্ষয়কে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি। আর গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা দানের জন্য ভূমিকা, উপসংহার ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সন্তোষকুমার ঘোষ : সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও পর্যবেক্ষণ

সন্তোষকুমার ঘোষ কোন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছেন এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সেই দিকটিকে যেমন আলোকপাত করেছি তেমনি তাঁর সাহিত্যে তা কতোটা প্রভাবিত করেছে সেই দিকটিকেও আমরা দেখিয়েছি। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে সন্তোষকুমার ঘোষ যে সময়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা এক ঝড়-ঝঞ্ঝার কাল। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ—এসবই সে সময়কার দেশ ও জাতিকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিয়েছিল। আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে বিশ শতকের চল্লিশের গোটা দশকটাই ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনায় দেশের সামাজিক জীবনের ভাঙন ধরিয়েছে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে নিঃশেষ ও নিগড়ে ‘আমসিতে’ পরিণত করে দিয়েছে। আর এই সেকল ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো এই সময়ের জীবন ও সমাজকে চাখতে চাখতে সন্তোষকুমারের লেখালেখিতে হাতেখড়ি। তাই নিছক রোমান্টিক কাহিনি তাঁর কথাসাহিত্যে দেখা যায় না। তিনি যে সস্তা বস্তাপচা গল্প লিখতে আসেননি, তার বড়ো প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘কিনু গোয়ালার গলি’। এই উপন্যাসটির মাধ্যমেই সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে পাঠককে জানিয়ে দেন নিজের কলমের ধার। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষ বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাঙালি জীবনের বিপর্যয়কে ও অবক্ষয়কে নিজের কথাসাহিত্যে তুলে এনে সেখান থেকে তিনি যেমন বেআবরু জীবনকে আঁচড়ে আঁচড়ে চিনিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তেমনি আবার চরিত্রের ভিতর ও বাহিরে প্রবেশ করে তার পতন ও পচনকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন। আর এখানেই বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে তিনি একজন বিচক্ষণশীল কথাসাহিত্যিকের ভূমিকা পালন করেছেন। যেখানে দেখতে পাবো তিনি কীভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে নিজেকে একজন

প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—সেই জীবন সংগ্রামের ইতিহাস। ছোটো থেকেই মনের মণিকোঠায় তিনি যে সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা লালন করে এসেছিলেন তা তিনি নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মরতে দেননি বলেই আজ আমরা তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছি। জীবনকে দেখা ও ভাবা যে তাঁর জীবনচর্যার একটি অন্যতম দিক এই অধ্যায়ে আমরা সেটাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কীভাবে না খেতে পাওয়া এই ছেলেটাই পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে বড়ো চাকরি করে সহৃদয় হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা এখানে তার ব্যক্তিগত জীবনের সহকর্মী ও বন্ধুদের বক্তব্য ও নানান লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছি। শুধুমাত্র সাহিত্যে নয় এই কর্মঠ মানুষটি কেমন ভাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগ দিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে চলিত ভাষার রীতি প্রবর্তন করে সুবিশাল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকাকে কোন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেই দিকটিকেও আমরা এই অধ্যায়ে দেখিয়েছি। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষ যখন যেটুকু করতেন তা খুব মনোযোগ দিয়ে ভেবে করতেন বলেই তিনি একই সঙ্গে সংবাদপত্রের মতো কর্মজীবনকে জীবিকা করেও এতো বড়ো মাপের একজন সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন। তিনি রিয়্যালিটি তথা বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে নিজের গল্প কাহিনির ভাবনা ভাবতে পারেননি। আর এই বাস্তবতা তথা রিয়্যালিটি যেহেতু লেখকের ব্যক্তি জীবনের জীবন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসে সেহেতু এই অধ্যায়ে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার দিকগুলি দেখিয়ে তাঁর ব্যক্তি জীবনের লেখক হয়ে ওঠার বিষয়গুলিকে তুলে এনেছি। যাতে আমরা দেখাতে পেরেছি কেন সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে বাঙালি জীবনের অবক্ষয়ের ছায়া ঢেকে আছে, আর কেনই বা তাঁর কথাসাহিত্য প্রথাগত কাহিনি ও চরিত্র থেকে আলাদা হয়ে উঠলো।

এছাড়া এই অধ্যায়ে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে বিশ্লেষণ করে তাঁর জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে আলোকপাত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলন : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে

সন্তোষকুমার ঘোষ বেড়েই উঠেছেন পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেখে। দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে সেই এক অসন্তোষ মুহূর্তে ১৯২০ সালে ৯ সেপ্টেম্বর

সন্তোষকুমার ঘোষের জন্ম। এছাড়া তাঁর পিতা সুরেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন স্বদেশকর্মী, বছরের বেশিরভাগ সময়ই হয় তিনি জেলে না হয় কলকাতার রাজপথে আন্দোলনে দিন কাটিয়েছেন। চারিদিকের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতাবরণ ও পিতার স্বদেশ ভাবনাই সন্তোষকুমার ঘোষের মনে শৈশব থেকে স্বদেশ প্রেমের বীজ বুনে দেয়। তাই তাঁর বহু গল্পে ও উপন্যাসে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা পাই। যেখানে অসহযোগ, আইন অমান্য, আগস্ট আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ও গান্ধীজীর নানান রাজনৈতিক অভিযান এবং উদ্যোগের কথা জানতে পারি। এই সব স্বদেশী ও আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি সন্তোষকুমার ঘোষের অনেক গল্পে ও উপন্যাসে চরমপন্থী ও বামপন্থীদের নানান বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকলাপ তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে শুধুমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেখেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর অনেক উপন্যাস ও গল্পে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দিকটিকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। তাঁর 'সুধার শহর' উপন্যাসে আদিত্য মজুমদার, 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে পশুপতিবাবু, 'দুই প্রস্ত' গল্পে সুহৃদদার বাবা, 'বিষ' গল্পে নীরদ প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পের এই সব ভণ্ড, শঠ রাজনৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দিকটিকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে স্বার্থের খাতিরে তারা নিজের আদর্শকে, মতকে বদলে দিয়ে স্বার্থান্বেষী হয়ে উঠেছে। অথচ এই সমস্ত রাজনৈতিক চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় তারা জনগণের সামনে সাদা পোশাকে এক ত্যাগী আদর্শ পুরুষের মুখোশ। কিন্তু তাদের অন্তরালে ছিল এক নক্রচরিত্রের বাস। তবে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর এই সমস্ত গল্পে ও উপন্যাসে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন। আর তাইতো 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে শুভাশীষের দাদুর আত্ম জবানিতে আমরা জানতে পারি ইংরেজি ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে শুরুর দিকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্‌মুহূর্তগুলি। কেমন ভাবে ইংরেজরা এ দেশে শাসন-শোষণ করে উপমহাদেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে বাধ্য করেছিল স্বাধীনতার কথা ভাবতে। শুধু তাই নয় এই উপন্যাসে আমরা যেমন জানতে পারবো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর যোগদানের ইতিবৃত্ত তেমনি কোন পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা স্বদেশী আন্দোলনকে নিজেদের মুক্তির মুখ ভেবেছিলেন তাকে। এছাড়া 'সুধার শহর' উপন্যাসে ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র বদল ও 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে

স্বাধীনতা আন্দোলনের দিগবদলের ভাবনাকে জানতে পারি। এর পাশাপাশি সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্পগুলিতেও কখনো উঠে এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীমুখ, কখনো দেশ সেবায় বিভিন্ন চরিত্রের আত্মবলিদান ও অক্লান্ত পরিশ্রম। আর এরই মাঝে আমরা দেখতে পাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নরমপন্থী, ও চরমপন্থী এবং বামপন্থীদের নানান কার্যকলাপ ও দলীয় ভাবনাচিন্তা। যেখানে দেশ মুক্তির কামনায় এই সমস্ত চরিত্ররা নিজেদের ব্যক্তিসুখকে বর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মৃত্যুর মুখে। তাইতো মিনিদির প্রেমিক বিপ্লবী ছিলেন বলে তিনি মিনিদিকে ছেড়ে এক ডাকে চলে গিয়েছিলেন বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনতে। কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে যারা এই বিপ্লবী ছিলেন তাদের কোনো নারী সংসর্গ থাকতে নেই বলেই মিনিদির প্রেমিক মিনিদিকে নিজের সম্পর্ককে স্বীকার করতে পারছিল না। কারণ তাদের কাছে দেশ আগে তারপর ব্যক্তিগত ভাবনা। অর্থাৎ সে সময় দেশপ্রেমের আবেগ গ্রাম থেকে শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল বলেই আমরা দেখতে পাই এই উপন্যাসে মিনিদিও তার প্রেমিককে বিপ্লব করতে যেতে দিয়েছিলেন। সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর কলমে সেই পরাধীন ভারতবর্ষের সেই আবেগ ও সামাজিক ভাবনাকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশভাগের চিত্র : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে

‘দেশ’ পত্রিকার পাতায় সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় দেখা সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিক ঘটনা হলো দেশভাগ। তিনি মেনে নিতে পারেননি এভাবে দাঙ্গা, ধর্ষণ ও লুঠের মধ্যে দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের ভাতৃত্ববোধ, ঐক্যবোধ নিমেষেই ভুলে শুধুমাত্র ধর্মের উস্কানিতে পরস্পর পরস্পরের চিরশত্রু হয়ে উঠবেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যখন দাঙ্গার মাধ্যমে বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড়ো অবক্ষয়ের দিন চলে এসেছিল তখন সন্তোষকুমার ঘোষ কলকাতায় ছিলেন, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন এই ভয়ঙ্কর তাণ্ডবকে। এছাড়া তিনি কর্মসূত্রে একজন সাংবাদিক হওয়ায় বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং ছাপিয়েছেন দেশহারা উদ্বাস্তু মানুষদের যন্ত্রণা ও বোবাকান্নাকে। একদল মানুষ যখন স্বাধীনতা লাভে খুশির আনন্দ আকাশে বাতাসে বইয়ে দিয়েছিল তখন আর একদল মানুষ সে সময় এই স্বাধীনতার কারণে নিজেদের মাতৃভূমি, বাড়িঘর হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে এক অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়িয়েছিল—এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষদের হাহাকার ও বেদনার ছবি আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে বারবার খুঁজে পাই।

আর তাইতো এই দেশভাগের কারণে 'দ্বিজ' গল্পে নিশিকান্ত চক্রবর্তী নিজের দ্বিজত্বকে বিসর্জন দিয়ে সুশীতল বিড়ির কারখানায় কর্মচারী হয়েছে। 'গিল্টি' গল্পে সীতা শিক্ষক পিতার কন্যা হলেও শেষে বেঁচে থাকার জন্য দেহব্যবসায় নেমেছে, 'প্রাচীর' গল্পে মণিময় ও নিরুপমার সুখের দাম্পত্য জীবন ভেঙে নিরুপমাকে বানিয়ে দিয়েছে ধর্ষিতা নারী। আবার 'কস্তুরীমৃগ' গল্পে শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়িঘর, হোটেল সব পূর্ব পাকিস্তানে ফেলে এসে কলকাতার এক বস্তির গুদামঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয় 'সময়, আমার সময়' উপন্যাসে আবার এই সমস্ত উদ্বাস্তু অসহায় ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, কর্মহীন মানুষরাই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় চলে এসে কেবলমাত্র নিজেদের মৌলিক চাহিদাগুলিকে মেটাতে কলকাতায় আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে বিপ্লবের নেশায়। কারণ জীবন যেখানে থমকে যায়, আশা সেখানে মিশে যায়, বিশ্বাস যেখানে ক্ষয়ে যায় সেখানে তো এরকম জীবন যন্ত্রণার থেকে বেঁচে থাকার লড়াই চলে আসবেই। তাইতো সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর এই দেশহারা গল্পগুলিতে ছিন্নমূল মানব যন্ত্রণার ছবি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তা নইলে আমরা বুঝতামই না 'গিল্টি' গল্পের সীতা কেন শিক্ষক পিতার কন্যা হয়েও শেষে নিজের জীবন ও পরিবারকে বাঁচাতে বেশ্যাপনার কাজকেই গ্রহণ করলেন। আর কেনই বা 'দুই প্রস্থ' গল্পে মমতাকে পরীক্ষার ইন্টার্ভিউয়ে গিয়ে পরীক্ষকের সামনে বলতে হলো, আমরা পূর্ববঙ্গের বলে কি কোনো সুযোগ সুবিধা পাবো না। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষ জীবন ও সমাজকে খুব গভীরভাবে দেখেছিলেন বলেই নিছক কাহিনি দিয়ে তিনি গল্প সাজাননি বা বলেননি। আর তাই এই সমস্ত গল্পগুলি এখনো পড়লে বোঝা যায় কোন জীবন যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষরা কতোটা অসহায় ভাবে সেদিন বোবাকান্না কেঁদেছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা দেশভাগের প্রেক্ষিতে সেই সময়কার মানুষদের, সেই অসহায় জীবনের পাশাপাশি সমাজ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকটি তাঁর গল্প ও উপন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। তাইতো আমাদের এই অধ্যায়ে দেশভাগের তাৎক্ষণিক মুহূর্তে দেশ ও জনজাতির অসহায় রূপটিকে যেমন এখানে দেখিয়েছি তেমনি এর পাশাপাশি এই সমস্ত মানুষরা যখন দেশ ও জনজাতির কাছে যখন কোনো সাহায্য ও আশ্রয় পেলো না তখন তাদের সেই ক্ষোভ

ও বেদনা কীভাবে পুঞ্জিভূত হয়ে আন্দোলনের অভিমুখে নিয়ে গিয়ে সমগ্র কলকাতা শহরকে উত্তাল করে তুলেছিল সেই দিকটিকেও আমরা ধরার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

দারিদ্র্য-বেকারত্ব : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে

সন্তোষকুমার ঘোষ শৈশব থেকে যে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা মেরুদণ্ডহীন মুখ থুবড়ে পড়া ইংরেজ শাসকদের শোষণে শোষিত ও নিঃশেষিত। আর তাইতো তিনি অর্থের অভাবে মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়া অসম্পূর্ণ রেখে চাকরির খোঁজে চল্লিশের দশকে কলকাতার রাজপথে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন। শেষে কোনো চাকরি না পেয়ে তিনি সংসারের হাল ধরার জন্য একসঙ্গে একাধিক পত্রিকা অফিসে কাজ নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি 'প্রত্যহ', 'যুগান্তর', 'মর্নিং নিউজ', 'দ্য নেশন', 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় কাজ করেছিলেন। কারণ যুদ্ধের বাজারে চাকরির কোনো নিশ্চয়তা ছিল না বলেই তিনি একসঙ্গে একাধিক পত্রিকা অফিসে অমানুষিক পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন। আর এই সময় পর্বেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে দেখেছেন দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের এক চরম দুর্দশাকে। তাইতো তাঁর বহু গল্পে ও উপন্যাসে আমরা দারিদ্র্য ও বেকারত্বের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাই। যেখানে শুধুমাত্র দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির জীবন দুর্বিষহ হয়ে এক ভয়ঙ্কর অবক্ষয় ও ভাঙনের মুখে চলে গেছে। অনেক মানুষ তাদের নিজেদের নৈতিকতা ভুলে শেষে অপরাধ ও অবৈধ পথে পা বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয় এই রকম পরিস্থিতিতে ঘরের মেয়েরা যখন কোনো উপায় না পেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বাইরের জগতে পা বাড়িয়েছে তখন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে শেষে তাদের দেহব্যবসায় নামতে হয়েছে। 'কানাকড়ি', 'গিল্টি', 'পনেরো টাকার বউ', 'চীনেমাটি', 'ঘর', 'দুই প্রস্ত' প্রভৃতি গল্পের পাশাপাশি আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'সুধার শহর', 'জল দাও', 'নানা রঙের দিন', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' প্রভৃতি উপন্যাসে এই দারিদ্র্য ও বেকারত্বের চিত্র খুঁজে পাই।

লক্ষ করার বিষয় এই সমস্ত গল্পের ও উপন্যাসের পরিবারগুলি শ্রেণিগত দিক থেকে প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির। যারা যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাজারে নিজেদের পারিবারিক

চাহিদাগুলি মেটাতে না পেরে বাড়ির মেয়েদের কাজের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, এরকম অসহায় ও নিরুপায় হয়ে। আর সমাজে ততদিনে নৈতিক মূল্যবোধগুলি অবক্ষয়িত হয়ে অর্থবোধের দিকে চলে গেছে। আর তাইতো 'চীনেমাটি' গল্পে প্রাণকৃষ্ণ নিজের স্ত্রী বকুলকে বড়লোক সুবোধ চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়েছিল স্ত্রীর সম্মানের কথা না ভেবে চাকরি পাওয়ার আশায়। আবার 'গিল্টি' গল্পে প্রেম-ভালোবাসা সব ক্ষয়ে গিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের মধ্যে চলে এসেছিল অবিশ্বাস তথা গিল্টিপনা। কারণ এই দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণেই সীতা সলিলের বিয়ের পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে বাধ্য হয়ে তাকে বেশ্যাপনায় নামিয়েছে। 'ঘর' গল্পে আবার কৃষ্ণকুন্তলার অনেক দিনের ইচ্ছা একটি সুন্দর ঘর বানিয়ে সুখে দাম্পত্য জীবন পালন করবে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি বলেই সে জড়িয়ে পড়ে জলধরের সঙ্গে অবৈধ নারী ব্যবসায়। আর এই অর্থনৈতিক কারণেই অনৈতিক পথে গেছে 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসের শুভাশীষ। কারণ বাড়িতে তার মা শুভাশীষের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে পারছিল না বলেই সে সেই কিশোর বয়সে বাধ্য হয়ে বরফ কলের কাজ নিয়েছিল। আবার 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের ইন্দ্রজিৎ সে সময় বি.এ পাশ করলেও নানা চেষ্টা ও প্রচেষ্টা করেও যখন নিজের জন্য সে কোনো চাকরিরই ব্যবস্থা করতে পারছিল না তখন সে বাধ্য হয়ে নিজের পেটের দায় বহন করার জন্য পত্রিকার প্রুফ সংশোধনের কাজ নেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

নীতি-বিশ্বাস ও প্রেমের অবক্ষয় : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদার অর্থনীতি—একই সঙ্গে এতগুলি দিক পরপর ভাবে চলে আসায় বাঙালি জনজীবনকে সে সময় এক বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিয়েছিল। যার কারণে মানুষ তার সনাতন মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে আর ধরে রাখতে পারেনি। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার কারণে সেদিন মানুষ তার নীতি-বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও বিবেকহীন হয়ে উঠেছিল। আর এরকম বিষাক্ত বিষের বাষ্পে প্রেম-বিশ্বাস যে থাকতে পারে না—তা সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে বিভিন্নভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তাই তাঁর কোনো গল্পেই প্রেম সার্থক পরিণতি লাভ করেনি, সন্দেহ ও অবিশ্বাসে ভেঙে গেছে সেই সব সম্পর্কগুলি। এই বিশ্বাস শুধুমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষেত্রে নয়, মা-

সন্তানের মধ্যেও ভেঙে গিয়ে এক অবক্ষয় ডেকে এনেছিল। 'প্রথম', 'দিনপঞ্জী', 'শনি', 'ছায়াঘর', 'যাদুঘর', 'সত্যসন্ধ', 'জোড়বিজোড়', 'হোলি' প্রভৃতি গল্পের পাশাপাশি 'কিনু গোয়ালার গলি', 'নানা রঙের দিন' 'সুধার শহর', 'সময়, আমার সময়', 'জল দাও', স্বয়ং নায়ক', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' প্রভৃতি উপন্যাসে যেমন একদিকে নীতি ও বিশ্বাসের চরম অবক্ষয় ঘটেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রেম-প্রীতি কোথাও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। যুগের দাবিতে, সময়ের বদলে তা পরিবর্তন ঘটে ক্ষয়ে গেছে।

আর তাইতো 'দিনপঞ্জী' গল্পে বিশ্বস্ত ওভারসিয়ার যে কিনা গঙ্গোত্রীকে নিজের আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস, নৈতিকতায় মন কেড়ে নিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেই কোম্পানির মালপত্র বিক্রি করে ও শ্রমিকদের মাইনে লোপাট করে সে পালিয়ে যায়। আবার 'শনি' গল্পে যমুনা যে স্বামীকে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভেবে দিন কাটানোর কথা ভেবেছিলেন, সেই স্বামীই শেষে দেখা যায় চুপি চুপি শাশুড়ির কাছে চাপ দিয়ে তিন হাজার টাকা পণ নিয়েছিল। আসলে সন্তোষকুমারের গল্পে দেখা যায় প্রেম-বিশ্বাস ও নৈতিকতাগুলি যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। আর তাই হয়তো তিনি সমাজ থেকে এই সমস্ত চরিত্রগুলির মুখ ও মুখোশকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তাইতো তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসের প্রমথের মতো স্বার্থান্বেষী, 'সুধার শহরে' আদিত্য মজুমদারের মতো ভণ্ড, শঠ দেশ নেতা, 'জল দাও' উপন্যাসে তিমিরবরণের মতো ধূর্ত আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র উঠে এসেছে। যেখানে এই সমস্ত চরিত্ররা কোনো না কোনোভাবে ব্যক্তি স্বার্থে নিজেদের নীতি-বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু ব্যক্তি স্বার্থে নয় এই অবক্ষয় যে মা-সন্তানের মধ্যেও চলে এসেছে তা আমরা 'সুধার শহর', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে' উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। যেখানে মা-সন্তানের পবিত্র সম্পর্কগুলি কীভাবে অর্থনৈতিক ও জৈবিক কারণে ক্ষয়ে গেছে তা আমরা দেখতে পাবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত্যু চেতনা : সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ও উপন্যাসে

এক দিক থেকে মৃত্যুও মানুষের জীবনে এক অবক্ষয়িত রূপ। আর তাই দার্শনিক ও কবিরা যুগ যুগ ধরে মৃত্যু নিয়ে তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে গেছেন। কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষও তাঁর কথাসাহিত্যে এই মৃত্যু নিয়ে নিজের লেখায় নিজস্ব চেতনাকে ব্যক্ত

করে গেছেন। যা তাঁর অনেক গল্পে ও উপন্যাসে নিজস্ব চেতনার আলোকে ফুটে উঠেছে এই মৃত্যু ভাবনা। এই অধ্যায়ে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের সমগ্র গল্পে ও উপন্যাসে তাঁর মৃত্যু চেতনার দিকটিকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে দেখিয়েছে। আসলে সন্তোষকুমার ঘোষের মধ্যে শৈশব থেকে মৃত্যু চেতনার বীজ ঢুকে পড়েছিল, যখন টাইফয়েড রোগে হঠাৎ করে তাঁর দাদা মারা যান। তখন তিনি তাঁর মায়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন দাদার মৃত্যু তাঁর মা'কে কেমন ভাবে শোকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিল। এরপর বাবা, মা'র মৃত্যু থেকে শুরু করে নানান আপনজনের মৃত্যু ও নিজের গলায় ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়া—তাঁকে তিলে তিলে তা ভাবিয়েছে ও ভিতরে-বাইরে নাড়িয়ে দিয়েছে। তাইতো গলার ক্যান্সার হওয়ার পর যখন তাঁর জবান বন্ধ হয়ে যায় তখন হাসপাতালে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গোনার যন্ত্রণা তিনি তাঁর ডাইরির পাতায় লিখে গেছেন। কীভাবে তাঁকে একটু একটু করে মৃত্যুর করালগ্রাস আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে, বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুই তিনি করতে পারছেন না—তা আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের 'চলার পথে' গ্রন্থটি পড়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। আর তাঁর এই মৃত্যু চেতনা তিনি তাঁর অনেক গল্পে ও উপন্যাসে বিভিন্ন কাহিনি ও চরিত্রের মাধ্যমে সেই মৃত্যু ভাবনাকে ব্যক্ত করে গেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সন্তোষকুমার ঘোষের সেই সব গল্প ও উপন্যাস বিশ্লেষণ করেই তাঁর মৃত্যু চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছি।

মানুষ তিল তিল করে যে জীবন গড়ে তোলে তা চিতায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কালের স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—সন্তোষকুমারের সমগ্র গল্প ও উপন্যাসের মৃত্যু ভাবাপন্ন কাহিনিগুলিতে এই সুরটিই ধরা পড়েছে। তার তাইতো 'সাধ' গল্পে যে সাধ নিয়ে গিরিবালা একসময় মৃত্যুকে উপেক্ষা করে জীবনকে ভালোবেসে নিজের রূপকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, বৃদ্ধ বয়সে এসে সেই গিরিবালাই মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভাবে জীবন আসলে জলের বুদবুদের মতো ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়। আর এই কারণেই 'শোক সুখ মৃত্যু' গল্পে লেখক বিজনের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন একটা বয়সের পর কেউ মরলে আমরা যখন কাঁদি, তখন মৃত্যুর জন্য ততটা কাঁদি না যতটা কাঁদি নিজের মৃত্যু শোকে। অর্থাৎ জীবন যেন একটা 'রিটার্ন টিকিট'-এর চলে যাওয়ার পালা, যতক্ষণ পৃথিবীতে আছি মায়া-মমতা ও নিজের সুখের আকর্ষণে আছি। আর তাইতো 'শোক' গল্পে সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধার উপলব্ধি, মৃত্যু আসলে সলতের তেল ফুরিয়ে নিভে যাওয়ার মতো। তাইতো 'যাত্রাভঙ্গ' গল্পে বৃদ্ধা হিমাংশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক ব্যঞ্জনাপূর্ণভাবে মৃত্যুর আগমন দেখিয়েছেন ভ্রমণ যাত্রা। মানুষের পৃথিবীতে

আসাও যে একটা কয়েকদিনের ভ্রমণের পালা সেটাই তিনি যাত্রাভঙ্গ মৃত্যুর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তবুও জীবন এক মায়াময় মরীচিকা বলেই তো ‘সুধার শহর’ উপন্যাসে নীলাদ্রি নিজের মারণ রোগের কথা জেনেও যে কয়েকদিন বাঁচবে সেই কয়েকদিন সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা ও নিজের অতৃপ্ত বাসনাগুলিকে পরিতৃপ্ত করে চলে যেতে চেয়েছিল। আর তাইতো নিজের প্রেমিকার দেহ সম্ভোগ করার সময় সে নিজেকে ‘ফাঁসির আসামির পেট ভরে খাওয়ার’ সঙ্গে তুলনা করেছে। আর তাই এই জীবনের ক্ষণস্থায়ী রূপ বুঝতে পেরে ‘নানা রঙের দিন’ উপন্যাসে দেবাশীষ তার মায়ের চিতাগ্নি দেখে এক প্রকার সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল। মরার আগে সেও জগৎ ও জীবনের অপরূপ সৌন্দর্যকে ঘুরে ঘুরে দেখতে চেয়েছিল। জীবন যে একটা রঙ্গমঞ্চের নাট্যশালা যার যখন অভিনয় শেষ হয়ে যাবে তার তখন বিদায়—সেই ভাবনাই সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে’ উপন্যাসে কথকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। মধ্য বয়সে এসে কথক উপলব্ধি করেছে মানুষের জীবনে আসলে সবকিছু বরাদ্দ রেশনের চাল-চিনির কৌটার মতো মাপা থাকে। আর তাই নির্দিষ্ট মাত্রা পূর্ণ হলেই তাকে মহাকালের অমোঘ নিয়মে বিলীন হয়ে যেতে হয়। আর তাইতো সন্তোষকুমার ঘোষ যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তখন মৃত্যু ভাবনা নিয়ে তাঁর ভাবনায় যে সমস্ত চিন্তা এসেছিল তা তিনি নিজের ডায়েরিতে লিখে গেছেন। আসলে মৃত্যুই যে মানুষকে একমাত্র ভয়-ভীতিতে আটকে রেখেছে এর চেয়ে আর বড়ো সত্য হয় না। তাই তিনি খুব সচেতন ভাবেই এই ডায়েরিতে লিখেছেন, সৃষ্টি রহস্যে ঈশ্বর একমাত্র মৃত্যুর ক্ষেত্রেই নিজের সাম্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া জীবনমৃত্যু নিয়ে তিনি এমন সব উপমা ব্যক্ত করেছেন যা সত্যি সত্যি দার্শনিক চিন্তা। যেমন মানুষের জীবনকে তিনি ‘ঘড়ির কাঁটা’, ‘রেশন’ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে জীবনের ক্ষণস্থায়ীতাকে বুঝিয়েছেন। আবার আরোগ্য থেকে হঠাৎ মুক্তিলাভের বিষয়টিকে ‘পেনশন নেওয়া’, ‘ভিখিরিপনা আয়ু’, ‘ফাঁসির আসামির’ সঙ্গে তুলনা করেছেন।